রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পভুবনে 'অতিথি' এক আশ্চর্য সৃষ্টি। 'সাধনা' পত্রিকার ভাদ্র-কার্তিক, ১৩০২ সংখ্যায় লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমে 'গল্প-দশক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় লেখাটি। আলোচ্য গল্পের সূত্রে আমাদের মনে পড়ে যায় ১৩০১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বিহারীলাল' প্রবন্ধের কথা। বিহারীলালের কবিতার একটি অংশ উদ্ধৃত করার পর কবি লিখছেন—

> আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন-অসহিষ্ণু স্বেচ্ছাবিহারপ্রিয় পুরুষ এবং একটি গৃহবাসিনী অবরুদ্ধ রমণী দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। একজন জগতের সমস্ত নূতন নূতন দেশ, ঘটনা এবং অবস্থার মধ্যে নব নব রসাস্বাদ করিয়া আপন অমর শক্তিকে বিচিত্র বিপুলভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল, আর-একজন শতসহস্র অভ্যাসে বন্ধনে প্রথায় প্রচ্ছন্ন এবং পরিবেষ্টিত। একজন বাহিরের দিকে লইয়া যায়, আর-একজন গৃহের দিকে টানে। একজন বনের পাখি, আর-একজন খাঁচার পাখি। এই বনের পাখিটাই বেশি গান গাহিয়া থাকে। কিন্তু ইহার গানের মধ্যে অসীম স্বাধীনতার জন্য একটি ব্যাকুলতা একটি অভ্রভেদী ক্রন্দন বিবিধ ভাবে এবং বিচিত্র রাগিণীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।
>
> (রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৬, পৃ: ৩৪১)

উপরি-উক্ত অংশটির পাঠের মাধ্যমে আমাদের অনিবার্যভাবে মনে পড়বে 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'দুই পাখি'। যেটি লেখা হয়েছিল ১২৯৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে। 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থেই 'বর্ষা-যাপন' কবিতায় উঠে এসেছিল ছোটোগল্পের স্বরূপ। 'দুই পাখি' কবিতার বনের পাখি যেন 'অতিথি' গল্পের তারাপদ। যে খেলার ছলে কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালবাবুর সংসারে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু 'স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন' তাকে চারদিক থেকে সম্পূর্ণভাবে ঘিরে ধরার আগেই চলে যায় সবাইকে ফাঁকি দিয়ে। সেইদিন ছিল বর্ষার রাত্রি। তারাপদর বয়স পনেরো-ষোলোর বেশি নয়। মূল চরিত্রের 'বয়ঃসন্ধি অতিক্রম করে সদ্য যৌবনে পদার্পণ' করবার প্রসঙ্গে সমালোচক তপোব্রত ঘোষ গল্পকারের নিজের জীবনের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। জীবনীমূলক সমালোচনার মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন--

> ... তারাপদর চরিত্রায়ণে রবীন্দ্রনাথ নিজেকেই নির্বারিত করেছেন।
>
> (রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ, দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১২, পৃ: ১৭৪)

শুধু 'অতিথি' নয়; রবীন্দ্রনাথের যেকোনো গল্প-উপন্যাস, নাটক এমনকি রাজনৈতিক প্রবন্ধের মধ্যেও উপস্থিত থাকেন কবি স্বয়ং। কবিসত্তার প্রকাশে তাঁর লেখাগুলি আলাদা মাত্রা পায়।

Debayan Chaudhuri, B.A (H), Bengali, Sem- 4, C8T, ছোটগল্প পাঠ- অতিথি

'অতিথি' গল্পের গঠনে ও ভাষাপ্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক কবিমন স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

(২)

'অতিথি' গল্পটি ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। গল্পের প্রথমেই জানতে পারি কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালবাবু নৌকো করে স্বদেশে যাচ্ছেন, পথে মধ্যাহ্নে হাজির হল এক বালক, নাম--তারাপদ। লেখকের বর্ণনায় ধরা পড়ে নামচরিত্রের অপাপবিদ্ধ স্বভাব—

> গৌরবর্ণ ছেলেটিকে বড়ো সুন্দর দেখিতে। বড়ো বড়ো চক্ষু এবং হাস্যময় ওষ্ঠাধরে একটি সুললিত সৌকুমার্য প্রকাশ পাইতেছে।... যেন সে পূর্ব-জন্মে তাপস-বালক ছিল এবং নির্মল তপস্যার প্রভাবে তাহার শরীর হইতে শরীরাংশ বহুল পরিমাণে ক্ষয় হইয়া একটি সম্মার্জিত ব্রাহ্মণ্যশ্রী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।
>
> (রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড,পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ: ৩৩৫)

মতিলালবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণা ছেলেটিকে দেখে উচ্ছ্বসিত হলেন। তারাপদকে আহার করানোর সূত্রে জেনে নিলেন তার পারিবারিক বৃত্তান্ত। 'সম্পূর্ণ নূতনতর' ছেলেটির ব্যক্তিত্বের নির্যাস সম্বন্ধে অবগত হয় পাঠক—

> ...দেখা গেল, ছেলেটি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে অথচ এমন সহজে করে যে, তাহাতে কোনোপ্রকার জেদ বা গোঁ প্রকাশ পায় না। তাহার ব্যবহারে লজ্জার লক্ষণও লেশমাত্র দেখা গেল না।
>
> (ঐ, পৃ: ৩৩৬)

কিংবা,

> তারাপদ হরিণশিশুর মতো বন্ধনভীরু, আবার হরিণেরই মতো সংগীতমুগ্ধ। (ঐ, পৃ: ৩৩৭)

যাত্রার দলই তাকে প্রথম বিবাগী করে দেয়। এরপর জিম্‌ন্যাস্টিকের দলেও সে জুটেছিল। সেখানে সে বাঁশি বাজাত। নানা দলের সঙ্গেও মিশেও সে ছিল স্বভাবতই স্বতন্ত্র। কেননা—

> ...অন্তরের মধ্যে সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং মুক্ত ছিল।... সে এই সংসারে পঙ্কিল জলের উপর দিয়া শুভ্রপক্ষ রাজহংসের মতো সাঁতার দিয়া বেড়াইত। (ঐ, ৩৩৭-৩৩৮)

বাঁশির কথা গল্পে আসে আবার। মতিলালবাবু ও অন্নপূর্ণার একমাত্র কন্যা চারুশশী ভেঙে ফেলে তারাপদর বাঁশি। 'বেশ করছি, খুব করছি' বলে রাগের বহিঃপ্রকাশ ও কেঁদে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে লেখক চারুর প্রেম-মনস্বত্ত্বকে অব্যর্থভাবে চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে

তারাপদর কাছে চারু নিতান্তই 'কৌতুকের বিষয়।' শ্রাবণ মাসে বিবাহের শুভদিন স্থির করে মতিলালবাবু তারাপদকে না জানিয়েই তার মা ও ভাইদের আনতে পাঠালেন। বিয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু তারাপদ কাউকে না জানিয়ে চলে গেল। শুধু যাওয়া স্রোতে ভেসে। কোনো মানসিক প্রস্তুতি সে দেয় নি কাউকে। অতিথির এই তো ধর্ম।

(৩)

'অতিথি' গল্পে পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এখানে পরিবেশ কেবল অলংকরণের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়নি, বরং গল্পের গঠনের প্রয়োজনেই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তারাপদ কাঁঠালিয়া গ্রামের জমিদার পরিবারের সঙ্গে 'অপূর্ব আকর্ষণে' আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এরমধ্যে কেটে গেছে দুই বছর। এমন সময় সে দেখল রথযাত্রার মেলার জন্য নৌকো ভেসে চলেছে। সেদিন ছিল জ্যোৎস্না-লোকিত সন্ধ্যা। 'চলমান' পরিবেশের আহ্বান এড়িয়ে যেতে পারল না তারাপদ। তার জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির যে নিবিড় সংযোগ! এই গল্পটি শুরু হয়েছিল নদী-পরিবেশে, সমাপ্তিতেও তাই ঘুরে এসেছে। নদীর আপনবেগে চলার সঙ্গে তারাপদর চরিত্র মিলে যায়। নদীপথ থেকে যে কিশোর ফিরে এসেছিল সংসারের মধ্যে, সে আবার নিরাসক্ত মনের তাড়নায় 'নদী স্রোতেই যেন হারিয়ে গেল'। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী খুব সুন্দরভাবে বলেছেন—

> একদিকে জীবনের গতিশীলতা, অন্যদিকে উদাসীন মানবমনের নিহিত নিরাসক্তির ব্যঞ্জনাকে ফুটিয়ে তুলতে রবীন্দ্রনাথ একাধিক গল্পে নদীর 'মোটিফ'কে প্রয়োগ করেছেন। আর নদী ও তার আনুষঙ্গিক পরিবেশের পূর্বোক্ত প্রবণতাগুলির মধ্যে সর্বায়ত বিশ্বজনীন লক্ষণ বর্তমান; তার মধ্য দিয়ে আভাসিত হয়েছে 'archetypal image' (বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রকৃতির ভূমিকা সম্পর্কে যাকে বলেছেন, "জীবনের আদিম ছাঁচ")-এর নান্দনিক ব্যঞ্জনা।
>
> (রবীন্দ্রনাথ: ছোটগল্পের প্রকরণ-শিল্প, সাহিত্যলোক, জুন ২০১৫, পৃ: ৮২)

এবার গল্পের শেষ পর্যায়ে আমরা এই মোটিফের 'চলমানতার ব্যঞ্জনাময়য় চিত্রকল্প' প্রত্যক্ষ করব; যা গল্পকে পরিণতির দিকে দ্রুত গতিতে নিয়ে চলেছে—

> দেখিতে দেখিতে পূর্বদিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন হইল—পূবে-বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল খলখল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল। সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা—চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে; মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান

উঠিয়াছে; দেখিতে দেখিতে গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল, সুদূর অন্ধকার হইতে একটা মুষলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল। কেবল নদীর এক তীরে এক পার্শ্বে কাঁঠালিয়া গ্রাম আপন কুটিরদ্বার বন্ধ করিয়া দীপ নিবাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘুমাইতে লাগিল।

(রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড,পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ: ৩৪৭)

শব্দের পর শব্দ, ছবির পর ছবি জুড়ে আখ্যানের দ্রুত গতি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। যেন স্থির বিন্দুতে এসে দাঁড়াল ক্ষণকালের জন্য। এই গল্পের সমাপ্তিতে চমক নেই। কিন্তু পাঠকের অন্তরে বেদনার অনুরণন আছে। সুদূরের আহ্বান যেন পাঠকের মনকে উত্তীর্ণ করে ‘এক লোকোত্তর সাঙ্গীতিক ব্যঞ্জনা’য়। তারাপদ-র মন মুক্তির আকাশে ডানা মেলতে চায়, আর পাঠক লাভ করে অপূর্ব অভিজ্ঞতা। আমাদের চিরচেনা জীবনের মানেটাই পাল্টে যায়। কিংবা অন্যভাবে ভাবলে এই অনিত্য সংসারে আমরাও যে অতিথিমাত্র!

.....